বিশ্বাস কি মানবমনে প্রোথিত? – একটি নিরাবেগ অনুসন্ধান

আশিক মাহমুদ রূপম

মানুষ স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাস করে। অসংখ্য ধর্ম রয়েছে তার বিশ্বাসের জন্যে। অনেকগুলোই একটি আরেকটির বিপরীত ধারণা দেয়। কোনটি বলে নিরাকার একেশ্বরের কথা, কোনটি সাকার একেশ্বর, আর কোনটি বলে অজস্র ঈশ্বরের কথা। এমন আরো অসংখ্য বৈপরীত্য আছে তাদের মাঝে। কিন্তু ধর্মগুলোর নিজ নিজ বিশ্বাসীরা ধর্মগুলোকে সমান দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে। অসাধারণ মানুষের এই অদৃষ্টে বিশ্বাসের ক্ষমতা, সম্পূর্ণ বৈপরীত্যে বিশ্বাসের ক্ষমতা।

মানুষ যুক্তি আর বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে ধর্মের ধারণাগুলোকে প্রশ্ন করার ক্ষমতাও রাখে। যুক্তিবুদ্ধিতে ধারণ করা বস্তুবাদী পৃথিবীর ধারণার কাছে ধর্মের ধারণাগুলো কখনো কখনো কাল্পনিক, অলীক-অনর্থক হয়ে ওঠে তার কাছে। পৈত্রিক ধর্মকে ত্যাগ করে সে তখন। নিজেকে অবিশ্বাসী হিসেবে আবিষ্কার করে।

মস্তিস্ক বিজ্ঞান বুঝলেও, প্রবৃত্তির সবটুকু হয়তো তা বোঝে না। তাই, সহজ হয় না এমন অবস্থায় স্থিত থাকা। অনুভূতির দূর্বল মুহূর্তে যুক্তিবুদ্ধি যখন দুর্বল হয়ে ওঠে, মনের কোন কুঠরিতে আবার স্থান করে নেয় নিজস্ব কোন পরিত্রাণকারী ঈশ্বর। মানসিক দুর্বলতা আর অসহায়ত্বকে যুক্তি দিয়ে যে প্রবোধ দেয়া যায় না, বিশ্বাস নিমিষেই সেখানে পরম স্বস্তি বুলিয়ে দেয়। পুনরায় অবিশ্বাসী হয়ে উঠতে যুক্তিবুদ্ধির অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় আবার। যেন বিশ্বাস করাটাই স্বাভাবিক। যেন মনের কোন কোণে রয়েছে বিশ্বাসের স্থায়ী আবাস।

মস্তিস্ক বিজ্ঞান বুঝলেও, প্রবৃত্তির সবটুকু হয়তো তা বোঝে না। তাই, সহজ হয় না এমন অবস্থায় স্থিত থাকা। অনুভূতির দূর্বল মুহূর্তে যুক্তিবুদ্ধি যখন দুর্বল হয়ে ওঠে, মনের কোন কুঠরিতে আবার স্থান নেয় নিজস্ব কোন পরিত্রাণকারী ঈশ্বর। মানসিক দুর্বলতা আর অসহায়ত্বকে যুক্তি দিয়ে যে প্রবোধ দেয়া যায় না, বিশ্বাস নিমিষেই সেখানে পরম স্বস্তি বুলিয়ে দেয়। পুনরায় অবিশ্বাসী হয়ে উঠতে যুক্তি-বুদ্ধির অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় আবার। যেন বিশ্বাস করাটাই স্বাভাবিক। যেন মনের কোন কোণে রয়েছে বিশ্বাসের স্থায়ী আবাস।

তার মানে কি বিশ্বাস করাটাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি? হয়তো তাই। অদৃষ্টে বিশ্বাসে মানুষ বেশ অভ্যস্ত। স্বাভাবিকভাবে মানুষকে একজন সৃষ্টিকর্তা, তার সৃষ্টি আর শাসনে বিশ্বাস করতে দেখা যায়। অপরটা, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাসও মানুষ করে, কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবে নয়। যথেষ্ট মস্তিষ্ক ক্ষয় করতে হয়। কিছু স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বাইরে যেতে হয়। যেন মস্তিষ্কে প্রোথিতই আছে মানুষ বিশ্বাস করবে ।

'প্রোথিত আছে'। এমন শব্দগুচ্ছ ধর্মপ্রাণদিগকের অত্যন্ত প্রিয়, স্বস্তিকর। আর অবিশ্বাসীদের জন্য প্রবল হতাশামূলক, সংশয়প্রদক। শুনে মনে হয়, যেন এক সুনিপুণ সৃষ্টিকর্তার দিকেই এই শব্দগুচ্ছ ঈঙ্গিত করছে। আর কেনই বা নয়? এমন অতিমানবীয় সৃষ্টিশীলতার উল্লেখ করে কর্তাকে উহ্য রাখলে সন্দেহ না করেই বা হয় কিভাবে?

মানুষ কার্য-কারণের যুক্তিপাত করে। ঘটনা ঘটলে মানুষ তার ব্যাখ্যা জানতে উদগ্রীব হয়, যেমন 'হয়তো বিশ্বাস করা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা' উপলব্ধি করার পর মানুষ তার ব্যাখ্যা জানতে উদগ্রীব হবে। কিন্তু, সমকালীন যুক্তির গণ্ডিতে সবকিছুর ব্যাখ্যা মানুষ সবসময় পায় না। কিছু ঘটনার ব্যাখ্যা জানতে তার বিজ্ঞান জানতে হয়, কখনো কখনো অপেক্ষা করতে হয় শতাব্দীকাল।

কিন্তু কার্য-কারণ যুক্তিপাতে মানুষ অধৈর্য, অস্থির। জোরালো যুক্তির পার্থিব ব্যাখ্যা পাওয়া না পর্যন্ত মানুষ বসে থাকে না। অজানা কারণের স্থান করে নেয় সর্বক্ষম কর্তা। মানুষের এই অধৈর্য অনুমানের বহু নমুনা পাওয়া যায় মানব সভ্যতার সমগ্র ইতিহাস জুড়ে। মানুষ জোরালো যুক্তির অপেক্ষা করে নি কখনো। তার বিনিময়ে তারা ভুল ও অলীকে নিমিষেই বিশ্বাসী হিসেবে ইতিহাসে নাম লিখেছে। কালের বিবর্তন, যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিকাশ একসময় তাদের ভুল প্রমাণ করেছে, করেছে লজ্জিত।

আমরা ভুলের এই দুষ্টচক্রের ঝুঁকি না নিয়ে বরং ধৈর্য ধরি ও নিরাবেগ থাকি। আর যুক্তি, চিন্তার সমস্ত দুয়ার খুলে দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি বিশ্বাসের রসায়ন। বুঝতে চেষ্টা করি - বিশ্বাস কি আসলেই প্রোথিত? কিভাবে মানুষ বিশ্বাসী হল?

মানুষ কি বিশ্বাসপ্রবণ?

গত শতকের ৪০ এর দশকে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্রিজ হেইদার ও ম্যারিয়্যান সিমেল গবেষণা করেন ক্রিয়া উপলব্ধি ও ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় মানুষের প্রকৃতির উপর [১]। তারা কিছু ব্যক্তিকে একটি চলচ্চিত্র দেখান, যাতে কেবল কিছু জ্যামিতিক আকৃতি যেমন - ত্রিভুজ, বৃত্ত চলাচল করতে থাকে। প্রদর্শনের পরে প্রদর্শিত দৃশ্য বর্ণনা করতে বলা হলে তারা জ্যামিতিক নক্সার এই চলাচলের মাঝে ‘পরিকল্পনা’, ‘অনুসরণ’, ‘পলায়ন’, ইত্যাদি খুঁজে পান। জ্যামিতিক নক্সাগুলো বর্ণিত হয় সাঙ্কল্পিক কর্তা হিসেবে। ঘটনা ব্যাখ্যায় ঘটক কর্তা (এমন কি যেখানে কোন কর্তা নেই) অনুমানের প্রবণতা দেখা যায় মানুষের মাঝে প্রবল।

ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় অদৃশ্য কর্তায় মানুষের বিশ্বাসপ্রবণতা তাই কেবল ধারণাই নয়, এর গবেষণামূলক ভিত্তি বিদ্যমান। কিন্তু, কি কারণ মানুষের এই বিশ্বাসপ্রবণ হয়ে ওঠার? এরও কি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে, নাকি যুক্তির যথেষ্ট আশ্বাসের অভাবে আমাদেরকে আবার সেই অনুমানের চক্রে ফিরে যেতে হবে?

এ মুহূর্তে ‘এ বিশ্বাস ঈশ্বরই দিয়ে দিয়েছেন আমাদের মাঝে’ বলে আমরা ক্ষান্ত হতে পারি। কিন্তু, যুক্তিরহিত ধর্মাবেগ মনের দুর্বল মুহূর্তে অমোঘ আশ্রয় হয়ে যে সাহস জোগাতে হয়তো পারে, তার সিকি অংশও পারে না জ্ঞানপিপাসু মনের তৃষ্ণা মেটাতে।

বুঝতে হবে, আমাদের এই ধর্মীয় ব্যাখ্যার দ্বারস্থ না হওয়াটা আমাদের নিজস্ব ধর্মানুভূতিকে উপস্থাপন করে না। না করাটাই ভালো। আমরা হয়তো নিজেরা কেউ বিশ্বাসী, কেউ অবিশ্বাসী, কেউ বা অনিশ্চিত। কিন্তু এ বিজ্ঞানালোচনায় ধর্মের দ্বারস্থ না হওয়ার জন্য এর কোনটি হওয়ারই প্রয়োজন নেই বা এর কোনটি হলেও অসুবিধা নেই। প্রয়োজন শুধু একটি বিজ্ঞানমনস্ক মুক্ত মন, সে তার ধর্ম বিশ্বাস যাই হোক।

যুক্তি, জগতের রসায়ন বড় নিরাবেগ। এখানে আবেগী মানুষ সর্বদাই বিজ্ঞানের আনাড়ি ছাত্র, ইতিহাসের লজ্জিত অলীক-অনুমানকারী। আমরা তাই জ্ঞানের জিজ্ঞাসায় কেবল বিজ্ঞানেরই দ্বারস্থ হচ্ছি। আমাদের প্রশ্ন, মানুষের বিশ্বাসপ্রবণ হয়ে ওঠার পেছনে ব্যাখ্যা কি? আশার কথা, বিবর্তন তত্ত্বের সাহায্যে এর একটি জোরালো ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব।

বিশ্বাসে বিবর্তনের ভূমিকা

বিবর্তনের ব্যাখ্যায় যাবার আগে যে কথা সম্ভবত না বললেই নয় - তা হলো বিবর্তন তত্ত্বের ধর্মগুলোর একনম্বর

শত্রুতে পরিণত হওয়া। সমকালের ধর্মীয় নেতাদের প্রায়শঃ দেখা যায় বিবর্তনের প্রতি তাদের বৈরীভাব প্রকাশ করতে। তারা মানতে চান না সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এই তত্ত্ব। হয়তো, তাদের অনেক কেচ্ছাই বিবর্তনের সামনে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে দেখে। কিন্তু, বিবর্তন তত্ত্ব নিজে কিন্তু কখনোই ধর্মতত্ত্বে উৎসাহী ছিলো না। বিবর্তন ধর্ম বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্ত বিজ্ঞান নয়। এ কেবল পরিবেশের সাথে জীবের অভিযোজনের মাধ্যমে প্রজন্ম পরম্পরায় তার প্রাপ্ত জৈব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের কথা বলে। এই অভিযোজন প্রক্রিয়ায় জীবগোষ্ঠীর যেসব সদস্যের বেঁচে থাকার ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশী হয়, তাদের প্রজননের সংখ্যা বেশি হবার সম্ভবনা থাকে এবং ঔ জীবকূলে তাদের জৈব বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য বেশি থাকে।

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এই তত্ত্ব কি আসলেই ধর্মের শত্রুতে পরিণত হবার যোগ্য? বিবর্তন অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মতই ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাবেগ। এটি না ধর্মীয় ব্যাখ্যাগুলোকে সমর্থন করে, না তাদেরকে বাতিল করে। কোনোটি করারই প্রয়াশ চালায় না সে। যুক্তরাষ্ট্রের কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত পদার্থবিদ লরেনস ক্রসও মনে করেন, বিবর্তনকে এভাবে শত্রু হিসেবে দেখা অহেতুক [২]। বিবর্তন কখনো বলে নি - এমনটি হতে পারে বা হতে পারে না যে কোন সর্বক্ষমতাধারী ঈশ্বরই প্রকৃতিতে বিবর্তনের তত্ত্ব আরোপ করে দিয়েছেন। যার আলোচনা এখনো বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না, তা নিয়ে বিজ্ঞান নিরাবেগ থাকবে, এমনটিই তো স্বাভাবিক।

ফিরে দেখি মানুষকে সভ্যতার প্রাথমিক পর্বে, যখন বাস করতো গুহায়। গুহার মুখে হঠাৎ যদি সে কোন শব্দ শুনতে পেতো, কি ভাবতো সে? কিছুই দেখা যায় নি এখনো, কিছুই জানা যাচ্ছে না - কি ওখানে। যদি ধরে নিতো কোন হিংস্র শিকারী জন্তু, তবে সে সময় পেতো সতর্ক ব্যবস্থা নেবার, অনুমান ভুল হলেও ক্ষতি নেই কোন। কিন্তু যদি ধরে নিতো কিছুই নেই ওখানে - কেবল বাতাসের নড়াচড়া, সত্যিই তা হলে তো ভালো; আর কোন হিংস্র জানোয়ার হলে এই অনুমান হয়ে উঠতো তার জীবনের জন্য মারাত্মক।

মানুষ কার্য-কারণের যুক্তিপাত করার ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাণী। এ ক্ষমতা তাকে ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। মানুষ প্রতিটি ঘটনা ব্যাখ্যা করতে চায়। গুহা মুখের শব্দ তাকে বিচলিত করে। কোন কর্তা, বিশেষ করে ক্ষতি করতে সক্ষম এমন কর্তার দ্বারা ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে, এমন অনুমান প্রায়শঃই তার জীবন বাঁচাতো। আর ওখানে কিছু নেই ধরে নিয়ে তার খুব উপকার কখনোই হতো না, বরং ভুল অনুমান হয়ে থাকলে তা হতো জীবনবিনাশী। সেযুগে মানুষের জীবনযাপনের এমন প্রতিবেশ, প্রেক্ষাপট আর বিবর্তন মানুষকে সাহায্য করেছে তার মস্তিষ্কে এমন উপাদান গড়ে তোলার, যা ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় সহসাই ও প্রয়োজনে যুক্তির বাইরে গিয়ে (সম্ভবত অধিক শক্তিশালী ও অনিষ্টক্ষম) কোনো কর্তাকে অনুমান করতে সাহায্য করে। কার্য-কারণের যুক্তিপাতে মানুষকে অধৈর্য করে তো বটেই।

এভাবে ক্রিয়াকে যুক্তির বাইরে এসে ব্যাখ্যা করাটা অনেকক্ষেত্রেই মানুষের জন্য হয়েছে নিরাপদ ও স্বস্তিকর। সত্যি কথা বলতে, অজানা ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় সহসাই কর্তাকে নিয়ে আসাটা মানসিক স্থিতিশীলতার দিক থেকেই তার জন্য স্বাভাবিক পছন্দ হয়ে ওঠে এবং তা সম্ভবত অনেকাংশে আজও বিদ্যমান রয়ে গেছে।

জগৎ-সৃষ্টি, ন্যায়-অন্যায়, নীতিধর্মের জটিল দার্শনিক প্রশ্নের মুখে স্বাভাবিক কর্তা হিসেবেই এভাবে সম্ভবত ঈশ্বর ও তার প্রণীত বিভিন্ন অনুশাসনের আগমন। এমন বিশ্বাস সম্ভবত মানুষের ওই বিবর্তিত ও অভিযোজিত বৈশিষ্ট্যেরই প্রকাশ। একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করে নিলে জটিল সব দার্শনিক প্রশ্নের চটজলদি উত্তর পাওয়া হয়ে যায়, স্বস্তিকর মানসিক অবস্থায় স্থিত হওয়া যায়। আর যুক্তি-বুদ্ধি-প্রমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হলে চুপ করে বসে থাকতে হয় ও অপেক্ষা করতে হয় কালাতিকাল অনুমানবিহীন। এমনটা তো মানুষের

বৈশিষ্ট্যে নেই।

ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় কর্তার সহসা অনুমানের বৈশিষ্ট্য কি করে মানুষকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী করে তোলে, তার আলোচনা বিজ্ঞানীরা করেন দুটি ভিন্ন তত্ত্বে - একটি হলো অভিযোজন তত্ত্ব, অপরটি - উপজাত তত্ত্ব। অভিযোজনবাদীরা মনে করেন, গুহামানবের শ্বাপদসংকুল প্রতিবেশকে যেমন সরাসরি মানুষ অভিযোজন করেছিলো, তেমনি ঈশ্বরে বিশ্বাসও আদি মানুষের মানসিক ভারসাম্যের জন্য একটি অপরিহার্যতা ছিলো। জটিল দার্শনিক প্রশ্ন বা অব্যাখ্যেয় প্রাকৃতিক ঘটনের সামনে অনুত্তর থাকা, বিপদ, অসুখ, দুঃখ দুর্ভোগে বিচলিত থাকার মতো অস্থিতিশীল মানসিক অবস্থার পরিত্রাণ হিসেবে ঈশ্বরে বিশ্বাস মানুষকে সরাসরি সাহায্য করেছে। আর এই বৈশিষ্ট্য মানুষ অভিযোজন করে নিয়ে নিজেকে আরও ভারসাম্যপূর্ণ করে তুলেছে।

অপরদিকে উপজাত তাত্ত্বিকেরা মনে করেন, ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় কর্তা অনুমানের মানুষের যে অভিযোজিত বৈশিষ্ট্য, ঈশ্বরে বিশ্বাস তার কেবল উপজাত মাত্র। বিবর্তনের কালপরিক্রমায় ঈশ্বরে বিশ্বাস কখনো মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদান ছিলো না, টিকে থাকতে তা মানুষকে সক্ষমতরও করে নি। মানুষের কর্তায় বিশ্বাস করে নেয়ার স্বাভাবিক প্রবণতার এ কেবল একটি প্রয়োগ উদাহরণ। বিশ্বাস করে নেয়ার যে উপাদান তৈরী হয়েছে মানুষের মাঝে, তারই বদৌলতে মানুষ অতিরিক্ত প্রয়োগ হিসেবে ঈশ্বর ও বিভিন্ন অদৃষ্টে বিশ্বাস করে।

অনেকটা যেন - ধনুকাকৃতির দুটি খিলানের মাঝে স্থান করে নেয়া ইংরেজি ‘ভি’ আকৃতির স্প্যান্ড্রেলের মতো। বিবর্তনতত্ত্বগত জীববিজ্ঞানে স্প্যান্ড্রেলের ধারণাটি প্রথম আনয়ন করেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী স্টিফেন জে গুলড [৩]। তুলনাটা এমন - খিলান হলো প্রতিবেশের সাথে অভিযোজনের মাধ্যমে তৈরী হওয়া মানুষের বিবর্তিত বৈশিষ্ট্য, অপরদিকে স্প্যান্ড্রেল মানুষের বিবর্তিত বৈশিষ্ট্যের জটিল বিন্যাসের মাঝে স্থান পেয়ে উৎপন্ন হওয়া একটি উপজাত। খিলান প্রয়োজনের নিমিত্তে তৈরী, স্প্যান্ড্রেল তৈরী নক্সার বাড়তি উপজাত হিসেবে, প্রয়োজনের তাগিদে নয়। কিন্তু দুটি খিলানের মাঝে স্থান করে নেবার পর তা বাড়তি উপাদান হিসেবে দেখা দেয়, চিত্রের স্প্যান্ড্রেলটির মতো মানুষের শিল্প ও কল্পনাকে জায়গা দেবার মতো যথেষ্ট স্থান করে নেয়। এই দুই তত্ত্ব সংক্রান্ত সুপাঠ্য আলোচনা বিজ্ঞানলেখিকা রবিন হেনিগ করেছেন নিউ ইয়র্ক টাইমসে তার প্রকাশিত প্রবন্ধ ‘ডারউনস গড’ এ।

মানুষের বিশ্বাস করার ক্ষমতা ও বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসের সাথে এর সম্পর্কের একটি সাযুজ্য পাওয়া যায় মানুষের কথা বলার ক্ষমতা আর সে ক্ষমতার সাথে বিভিন্ন ভাষার সম্পর্কের মাঝে। বিশ্বাসের ক্ষমতা যেমন মানব মস্তিষ্কে বিবর্তন দ্বারা প্রোথিত উপাদান, তেমনি কথা বলতে শেখার ক্ষমতাও মানব শিশু জন্ম থেকেই বহন করে। বিবর্তনের মাধ্যমে এর উৎপত্তি। মানুষের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হয়, কিন্তু সব মানুষ কথা বলার বা কোন ভাষা শিখে নেবার ক্ষমতা বহন করে। যেমনটি, মানুষের রয়েছে বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাস, কিন্তু প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই তাদের নিজ নিজ ধর্মে সমান-প্রবলভাবে বিশ্বাসী। ধর্ম এমনকি পরিবর্তন পর্যন্ত হয়ে যায় ধর্মান্তরের মাধ্যমে। কিন্তু মনের গভীরে বিশ্বাসের যে আবাস, তা কখনো নিশ্চিহ্ন হয় না।

নিরাবেগ সমাপ্তি

এতক্ষণে এসে এই আবেগমুক্ত আলোচনা হয়তো একজন বিশ্বাসীর কাছে নিরানন্দ হয়ে উঠেছে। 'সম্ভবত বিশ্বাস মানবমনে প্রোথিত' বিশ্বাসীদের জন্য আপাত প্রলুব্ধকর এই প্রস্তাবনাকে এই আলোচনা যথেষ্ট সাদাসিধে করে ফেলেছে। কেননা আমরা আগেই মেনেছি, বিজ্ঞানালোচনায় আবেগমুক্ত থাকাটা জরুরি। যুক্তিবুদ্ধির বাইরে তাই কোন অতিরিক্ত প্রস্তাব বা দাবি উত্থাপন করা হয় নি এখানে, করার সুযোগও নেই। আরো যথাযথভাবে বলতে গেলে, এখানে কেবল এটুকুই প্রস্তাব করা হয়েছে - 'সম্ভবত বিশ্বাস মানবমনে প্রোথিত' এবং বিবর্তনে তার ব্যাখ্যা আছে। এমন নিরাবেগ সত্যানুসন্ধান একজন অবিশ্বাসীর কাছেও কষ্টকর হতে পারে। যেমনটা সম্ভবত একজন শান্তিবাদীর কাছে হতে পারে মেনে নেয়া যে - 'হিংস্রতাও মানবমনে প্রোথিত' এবং বিবর্তন এরও ব্যাখ্যা করে।

এ আলোচনা কিছু সত্য উদঘাটনের পাশাপাশি কিছু প্রশ্নও রেখে যাচ্ছে। যেমন, আমরা কি তবে বিশ্বাস করতেই থাকবো কিংবা হিংস্রতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে, আমরা কি তবে আরও হিংস্র হয়ে উঠবো। তার উত্তর না হয় পরবর্তীতে কোন দার্শনিক আলোচনার মাধ্যমে আমরা বের করার চেষ্টা করবো। আপাতত আমরা বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হিসেবে নিরাবেগ ব্যাখ্যাগুলোকে মুক্ত মনে গ্রহণ করি।

সত্যসন্ধানে আবেগের স্থান নেই। সত্যসন্ধানে তাই থাকতে হবে নিরাবেগ, থাকতে হবে মুক্ত। সংস্কারাচ্ছন্ন গণ্ডিবদ্ধ মন নিয়ে গূঢ় জগতের জটিলতাকে ধারণ করা যাবে না।

(চিত্রটি এইনার এইharsn Baran এর তোলা গনু মুক্ত দলিলে লাইসেন্সকৃত ছবি থেকে সম্পাদনা করা হয়েছে)

লেখক একজন কম্পিউটার প্রকৌশলী এবং বিজ্ঞান লেখক ।

তথ্যসূত্র:

১. http://members.westnet.com.au/emmas/2p/thesis/1.htm
২. http://www.economist.com/world/displaystory.cfm?story_id=9036706
৩. http://en.wikipedia.org/wiki/Spandrel_(biology)